মন পুষ্টিবিতান ‘লাইব্রেরি’

শাজাহান চাকলাদার

গ্রন্থাগারের আক্ষরিক অর্থ বই, পত্রপত্রিকার আলয় বা নিবাস। ‘পাঠাগার’ একই ব্যাকরণে পঠনকে প্রথম গুরুত্ব দেয়, তারপর আসে পাঠের জন্য নিভৃত নিকেতন, সেখানে নামকরণটি ভাবযোগে বিষয়ের অন্তরে যতটুকু প্রবেশযোগ্য মনে হয়, বই বা পুস্তকের গন্ধ প্রত্যক্ষভাবে ততটুকু মনে ছায়া ফেলে না। এসব বিবেচনায় বাংলায় প্রচলিত ‘লাইব্রেরি’ শব্দ হিসেবে ও সামগ্রিক ব্যঞ্জনায় এবং ভর ও ওজনের মাপে এগিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। কাব্য করে কেউ একে ‘বইঘর’ও বলেন, যা ‘গ্রন্থাগার’-এর বিকল্পমাত্র। তবে ‘লাইব্রেরি’র ভিন্ন অর্থ আছে আমাদের দেশে; প্রায় সব পুস্তক ব্যবসায়ী ও কিছু পুস্তক প্রকাশক তাদের বাণিজ্যিক কর্মস্থলের নামকরণে ‘লাইব্রেরি’ যুক্ত করেন। এটি ‘Book shop’-এর দেশীয় সংস্কারসিদ্ধ নামকরণমাত্র।

একুশ শতকের গোড়ার দিকে ইউনেস্কো লাইব্রেরির যে-সংজ্ঞা দিয়েছে, সেটি যথার্থই আধুনিক ও অর্থবহ। ইউনেস্কোর মতে “Any organized collection of printed books and periodical or any other graphic or audio-visual materials with a staff to provide and facilitate the use of such materials as are required to meet the information research, educational and recreational needs of users”. আজ তাই দেশের লাইব্রেরিগুলোকেও নবসজ্জায় সমৃদ্ধ করার সময় এসেছে।

বেঁচে থাকার নানা উপাদান খুঁজতে মানুষ বিশ্বব্যাপী যাযাবরের মতো জলে-স্থলে ঘুরে বেড়িয়েছে, সন্ধান করেছে অচিন দেশ ও সম্পদ, বাঁধিয়েছে যুদ্ধ, সংহার করেছে অসংখ্য প্রাণ। আবার আবিষ্কারও করেছে একই পথে নানা কিছু, বাড়িয়েছে জ্ঞান। এসব নিয়ে জীবন থেকে জীবনান্তরের দীর্ঘ পথে তার প্রয়োজন হয়েছে শব্দ ও ভাষার। ভাষা অভিন্ন হতে পারে নি জীবনাচারের বৈচিত্র্যময়তার কারণে, কিন্তু মাধ্যম সে খুঁজেছে অবিরাম একটি সংগ্রহশালার–যেখানে আহরিত ও উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা যায়। পশুর চামড়া, শিলা, গাছের বাকল, পাতা, মাটি, প্যাপিরাস ইত্যাদির মধ্যে নানা উপকরণে আঁচর কেটে সে অক্ষয় করে রাখতে প্রয়াস পেয়েছে।

আজকের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলার যত শাখা এমনকি মহাকাশতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা–সবই সে নানা ভাণ্ডারে জমা করেছে যুগে যুগে। এই পথচলার নাম সংস্কৃতি। ক্রমাগত এর বিকাশ হয়, বৈচিত্র্যময়তায় রাঙিয়ে তোলে তার রূপ। আর রূপায়ণের এই পথেই সার্থকভাবে সংরক্ষণের স্বপ্নীল অভিপ্রায় জন্ম দেয় ‘লাইব্রেরি’র। আধুনিক জীবন-ব্যবস্থায় লাইব্রেরির কোনও বিকল্প নেই। কম্পিউটার-নির্ভর জীবনেও এর অপরিহার্যতা পরীক্ষিত সত্য। জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় লাইব্রেরির ভূমিকা এতই প্রবল যে, বলা হয় যে-জাতির

লাইব্রেরি যত সমৃদ্ধ সে-জাতি তত উন্নত। মহাকালের অসীম প্রান্তরে যে-কল্পিত কাল ও যুগবিভাগ সেখানে লাইব্রেরি ভাষিক, শাব্দিক ও বাচিক সেতু হয়ে অসামান্য দৃঢ় এক বন্ধন তৈরি করেছে, যার স্পর্শে মানুষ হয় 'মানবিক'।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী জলধোয়া সবকটি দেশ বিশ্বসভ্যতায় যে-প্রাথমিক ছাপ রেখেছিল তার মাঝে ব্যাবিলনভিত্তিক আসিরিয় সভ্যতার অগ্রগামিতা ছিল উজ্জ্বলতর। আসিরিয় সম্রাট আসুরবানির লাইব্রেরির কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে রূপকথার মতো। পার্চমেন্ট, প্যাপিরাস, ক্লে-ট্যাবলেট, পাথরের চাঁই ইত্যাদির মাঝে অঙ্কিত হতো বর্ণ-ছবি-সংকেতের ভাষায় নানা বিষয় যা কালিক নিদর্শন শুধু নয়, অতীতের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত হতো। অনাগত মানুষ ও সময়কে সেই কালেই লাইব্রেরির অভিধায় সেতুবন্ধনের বৃত্তে আসীন করার চেষ্টা হয়েছিল কর্মোদ্দীপনার ঐন্দ্রজালিক আকাঙ্ক্ষায়। সম্রাট আসুরবানির ওই লাইব্রেরিতে শুধু বস্তুখণ্ডই ছিল, বই বলে আজ যাকে আমরা জানি, সেটি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রাচীন সভ্যতার ওই লাইব্রেরিটি খ্রি.পূ. সপ্তম শতকে দাঙ্গা ও যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়।

তবে খোদাইকৃত ক্লে-ট্যাবলেট মাটি পুড়িয়ে পাথরের মতো শক্ত করে তৈরি ছিল বলে বহুসংখ্যক ট্যাবলেট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এর কয়েক হাজার নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। একই ভাবাদর্শে জ্ঞানপাল্লা ভারী করেছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিক রাজা টলেমি। খ্রি.পূ. তিনশ অব্দে হিব্রু ও লাতিন ভাষায় লিপিবদ্ধ কয়েক লক্ষ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে। তখনকার সময়ে ওই লাইব্রেরির গঠনশৈলীর কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। সেখানে পাঠকক্ষ, হলঘর, খাবার ঘর, উপাসনালয় ইত্যাদি সবই ছিল, যা পরিচালিত হতো ও মুখরিত থাকত বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানপিপাসুদের দ্বারা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের মানবিক হয়ে ওঠার কারিগর 'লাইব্রেরি' কী ভূমিকা রাখে, এই প্রাচীন দুটি কীর্তিই তার উদাহরণ। মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই বিশাল স্থাপনা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার-প্রসারের ডামাডোলে ও জুলিয়াস সিজারের আক্রমণকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদা নাস্তিকতার চর্চাস্থল ও কাল্পনিক অপশিক্ষার কেন্দ্র অভিহিত করে ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে অর্থোডক্স বিশপ থিওটিলাস এটি পুরোপুরিই ধ্বংস করে।

উপমহাদেশে ভারতের বিহার রাজ্যের অর্ন্তগত পাটনার নালন্দা নামক স্থানে ছিল বৌদ্ধবিহার। খ্রি.পূ. ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের দিকে এখানে গড়ে ওঠে নালন্দা মহাবিহার লাইব্রেরি। প্রধাত পাতার মধ্যে লেখা দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যার বিপুল সংগ্রহ ছিল এখানে। তের শতকের গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণে এই লাইব্রেরিটি ধ্বংস হয়ে যায়। এ-বিষয়ে জানা গিয়েছে মাত্র আড়াইশ বছর আগে। ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার কানিংহামের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য প্রকাশ পায়।

মধ্যযুগে বাংলায় হোসেন শাহীর রাজবংশ রাজকীয় লাইব্রেরি গঠন করেছিল। সেখানেও

পুস্তকাকারে নয় বরং পূর্বোক্ত বিভিন্ন মাধ্যমে সংকলিত বিষয়াদির সংগ্রহই ছিল মূখ্য। প্রথম মুদ্রিত বই ও পাণ্ডুলিপির লাইব্রেরি ছিল কলকাতার শ্রীরামপুর মিশনে। আঠারো শতকের শেষের দিকে এটি গঠিত হয়েছিল। বই-পুস্তক ও পুঁথির সংগ্রহশালা ছিল কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সামন্ত সমাজ-কাঠামোর আওতায় জমিদার ও জমিদার-পোষ্য বিদ্যানুরাগীদের আনুকূল্যে কালে কালে বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'লাইব্রেরি' গড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মানুশীলনের জন্য ও ব্রাহ্মবাদীদের আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার-সুবিধার জন্যও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ঢাকার বিখ্যাত রামমোহন লাইব্রেরি ছিল ব্রাহ্মবাদ-উদ্দীপক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফসল। ভারত ভাগের আগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ইংরেজি শিক্ষার প্রস্তুতিকালে গ্রন্থপাঠ অপরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে (যেমনটি দেখি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠবিকাশকালে মুদ্রণসুবিধার বিস্তারে) এবং ঔপনিবেশিক পরিবেশেই আপন সত্ত্বার সন্ধানে মানুষের পুস্তক সংগ্রহে আগ্রহ তৈরি হয়।

এই সামাজিক অগ্রযাত্রায় গ্রামভিত্তিক একক অনুপ্রেরণায় আপন গৃহে পুস্তকভাণ্ডার তৈরিতে একরকম আত্মার আনন্দ-উৎস ঘনীভূত হয়। গৃহস্থালি মানুষ এই শ্রেণীর বাড়িকে 'বইওয়ালা বাড়ি' বলে জানত। অনধিক পঞ্চাশখানা বইয়ের একটি সংগ্রহকেই সৌখিন পাঠক 'লাইব্রেরি' নাম দেয়। কিন্তু ১৯৪০-এর দিকে ব্যাপক নগরায়ণ ও শিক্ষিত শ্রেণীর শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের কারণে গ্রাম-লাইব্রেরিগুলো ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। অন্যদিকে তারও আগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে শহরভিত্তিক মুদ্রিত সম্ভারের সংগ্রহশালা। এক তথ্যে জানা যায়, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজের সংগ্রহে থাকা প্রায় ১৮,০০০ পুস্তক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুসারে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার হচ্ছে দেশের সকল গ্রন্থের কপিরাইট সংরক্ষণশালা। শেরেবাংলা নগরে স্থাপিত এই লাইব্রেরিটি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সংক্ষিপ্তসার, প্রকাশক-অভিধান এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী। অবিভক্ত বাংলায় পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির মধ্যে ছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বরিশাল, যশোহর ও রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরি এবং বগুড়ার উডবার্ন লাইব্রেরি। এরপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পাই ঢাকার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। ঢাকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৩ খ্রি.। এতে ঢাকার পূর্বতন পাবলিক লাইব্রেরি নামক সংস্থাটি যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এর শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় অফিসেও রয়েছে গুণমানসম্পন্ন একটি লাইব্রেরি।

এ-ছাড়া দেশের প্রায় সব বড় এনজিও সংস্থা যেমন ব্র্যাক, কারিতাস, আহসানিয়া মিশন ইত্যাদির রয়েছে নিজস্ব লাইব্রেরি। বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। বিষয়ভিত্তিক ও পেশাজীবী শিক্ষা-প্রশিক্ষণেরও রয়েছে মানসম্মত লাইব্রেরি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমসাময়িক জ্ঞানচর্চার সহজগামিতায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক

পুস্তক, পিরিয়ডিকলস, ম্যাগাজিন, ডকুমেন্টরি ইত্যাদি নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এ-ছাড়া রয়েছে ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) এবং বাংলাদেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)। শেষেরটি সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার-এর সদস্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য ন্যাশনাল হেলথ লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বারডেম লাইব্রেরি ছাড়াও দেশের প্রায় সব মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক লাইব্রেরি। জাতীয় নানা প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি, যেমন– বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একাডেমি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইনস্টিটিউট। ব্যানবেইস বলছে, এ ধরনের বিশেষ লাইব্রেরির সংখ্যা প্রায় ৭০০। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে গড়ে ওঠা লাইব্রেরি রয়েছে প্রায় সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরে। সরকারি লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি হচ্ছে বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' পুস্তক সংগ্রহ, প্রকাশনা ও বিপণনের একটি গুরুতপূর্ণ সংস্থা যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে 'মহানগর পাঠাগার' নামক একটি লাইব্রেরি। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)-এরও রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্বনামধন্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মননশীলতার উৎকর্ষের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় একটি প্রকল্প গঠন করেন এবং দেশের সর্বত্র পাঠাভ্যাসের আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়' মন্ত্রবাণী তরুণ-যুবাদের মধ্যে সঞ্চার করার অভিপ্রায় নিয়ে গড়েন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,' যেখানে পাঠাভ্যাসের অনুশীলন ছাড়াও রয়েছে সংগৃহিত পুস্তকের বিশাল ভাণ্ডার। আজ তার নতুন আবাহনী সুর 'আলোকিত মানুষ চাই।' বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরিপ্রেমিদের কাছে চমৎকার এক জ্ঞানবৃক্ষ।

একটি বিশেষায়িত লাইব্রেরি–প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়:

৩১ হাজারেরও বেশি প্রকাশনা-সংগ্রহ রয়েছে এই লাইব্রেরিতে। সকল প্রকাশনা Dewey Decimal Classification নিয়ম অনুসারে বিন্যস্ত। তার মধ্যে ১৮ হাজারেরও বেশি বই অনলাইন ব্যবস্থাপনায় সন্নিবেশিত এবং ৫ হাজারেরও বেশি নানা আঙ্গিকের রয়েছে ই-বুক। জাতীয় উন্নয়ন ও মানসিক পুষ্টির জন্য লাইব্রেরি ও বইপত্র পাঠ কতটা অপরিত্যাজ্য সেটি

বুঝতে হলে দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পয়লা নম্বর’ গল্পে উল্লেখিত চরণদ্বয়ের কথা বলতেই হয়-

‘যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।’

চার্বাকদের লোকায়ত দর্শনের বাহ্যিক সুখাস্বাদনে ঋণ করে হলেও ঘি খাওয়ার যে-প্রবণতার কথা প্রবচনরূপে মানুষের মুখে মুখে ফিরত, কবিগুরু সেই ইচ্ছারূপকে ‘বইপড়া’র জালে জড়ালেন। আর সেজন্যই চাই ‘লাইব্রেরি’র মতো নিরাপদ পুস্তক-বিতান।